বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলঃ নতুন ভাবনা ও সমালোচনা

(BANKIMCHANDRER BISHBRIKSHA O KRISHNAKANTER WILL: NOTUN BHABNA O SAMALOCHONA.)

ড. অন্তরা চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ, দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়,
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

KEY NOTES:-

শিল্পসৌকর্য, সামাজিক সমস্যা ,সামাজিক- নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, রূপলালসা, নাটকীয়তা।

ABSTRACT:-

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম দুটি সামাজিক উপন্যাস ‘বিষবৃক্ষ’ ও ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’- এ সামাজিক সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বের আধুনিক জটিলতা বিস্তৃতভাবে রূপায়িত হয়েছে। উপন্যাস রচনার বিশালতা, ব্যঞ্জনা, নাটকীয়তা, ব্যক্তিমনের দ্বন্দ্ব সর্বোপরি তৎকালীন একটি সামাজিক সমস্যা উপন্যাস দুটিকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট সামাজিক সমস্যাবহুল রচনা বলেই স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে উপন্যাস দুটির ত্রুটিগুলিও অগ্রাহ্য করার মতো নয়। গল্পের আখ্যান, বৈচিত্র্য, বাস্তব চরিত্র চিত্রণে দক্ষতা ও প্রচারমুখীনতা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় চরিত্রগুলির দুর্বলতা ও ধারাবাহিকতা যথেষ্ট পরিমাণে বিঘ্নিত হয়েছে। এই ত্রুটিগুলি কি রকম ও তার পরিণামে চরিত্রগুলি কিভাবে ট্রাজিক পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে তা পরিস্ফুট করাই আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম ঐতিহাসিক ও রোমান্সের কল্পলোক থেকে সমকালীন একটি বাস্তব সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। এখানে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির মানসিক দ্বন্দ্ব ও সমাজ সংস্কারের আবরণে একটি পরিবার ও তার সঙ্গে যুক্ত পাঁচটি প্রাণের বিয়োগান্তক পরিণতি হলো। নগেন্দ্র সূর্যমুখীর সুখী দাম্পত্য জীবনে অকস্মাৎ দৈবনির্দিষ্ট উপায়ে কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, তাকে নিয়ে নিজ বাড়ি গোবিন্দপুর এলেন। পরবর্তীকালে তার স্ত্রী সূর্যমুখীর আগ্রহে তার (সূর্যমুখীর) ভ্রাতা তারাচরণের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। অল্প কিছুদিন পর তারাচরণে দেহান্ত হলে কুন্দনন্দিনী আবারও নগেন্দ্রর বাড়িতে বসবাস করতে থাকে। এর পরের ঘটনা যথেষ্ট আকর্ষক ও

ঘটনাবহুল। নগেন্দ্রর কুন্দনন্দিনীর প্রতি প্রেমানুরাগ, বিবাহ ও সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ, জ্ঞাতি ভাই দেবেন্দ্রর নারীলোলুপতা, নগেন্দ্রর গৃহ পরিচারিকা হীরার কপটতা ও পাপলালসা বিভিন্ন ঘটনায় বিন্যস্ত হয়েছে। এ উপন্যাসে হীরা-কুন্দনন্দিনী ও নগেন্দ্র-দেবেন্দ্র চরিত্রসৃষ্টিতে লেখক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সূর্যমুখীও বাঙালী ঘরের চিরকালীন সুগৃহিনী। তবে কুন্দনন্দিনীর বিষপানে এ উপন্যাসের পরিসমাপ্তি। নগেন্দ্রর রূপতৃষ্ণা ও তার প্রতি কুন্দর নির্ভরতা এই ট্রাজিক পরিণতির জন্য দায়ী। সংসার অণভিজ্ঞতা কুন্দের প্রতি লেখক সুবিচার করতে পারেননি। দৈবের নিষ্ঠুর আঘাতের মতো কুন্দর আত্মহননের মধ্য দিয়েই উপন্যাসের শেষ তবে নগেন্দ্র সূর্যমুখীর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত উপন্যাসে ছিল না, কেবল সূর্যমুখীর মধ্যযুগীয় করুন বিলাপের মধ্য দিয়ে চিরন্তন সতী সাধ্বী নারীর চরিত্রটি রূপায়িত হয়েছে।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' এ সমাজ ও সমস্যা চিত্রণে অধিকতর সফলতা লক্ষ্য করা গেছে। অসুখী দাম্পত্য জীবনের কোন ছিদ্র দিয়ে পরকীয়া প্রেমের আগমন ঘটে তা নির্ণয় করা খুব কঠিন। কাহিনীটি অনিবার্য বেগের সঙ্গে ও দ্রুততার সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট করুণ পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। রোহিনীর প্রতি দুর্বলতা, ভ্রমরের অভিমান সর্বোপরি গোবিন্দলালের রূপলালসা এই কাহিনীতে একটি তাৎপর্যমণ্ডিত প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। গোবিন্দলালের সংযমী দুর্গ অনেক আগেই ধুলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল। রোহিনী নিমিত্র মাত্র। এখানেও নারীর প্রতি লেখক সুবিচার করেননি, একই দোষে দুষ্ট নারী-পুরুষ ভিন্নতর পরিবেশ লাভ করেছে- যেখানে মনুষ্যত্বের আবেদনের থেকে নীতিবোধ অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছে।

মূল প্রবন্ধ-

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমূহের মধ্যে 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই দুটি সামাজিক উপন্যাস সর্বাধিক আলোচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সমালোচকরা এই দুটি উপন্যাসের বহু আলোচনা করেছেন। এইসব আলোচনার মধ্যে উপন্যাস রচনায় বিশেষ করে সামাজিক উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের পারদর্শিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। উপন্যাস রচনার বিশালতা, সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা, ঘটনা পরম্পরা ও তীক্ষ্ন বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা তাঁর উপন্যাস দুটিকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু এই দুটি উপন্যাসে এমন কিছু

ত্রুটি ও শিল্পরীতির অসৌকর্য আছে যা সাধারণ পাঠকের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়। বঙ্কিম সমালোচকরা গল্পের নাটকীয়তা আখ্যান বা প্রচারমুখীনতা নিয়ে ব্যাখ্যা করায় কাহিনী বিন্যাসের ও উপন্যাসের চরিত্র গুলির দুর্বলতা ও ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়েছে, ফলে সাহিত্যমূল্যও যথেষ্ট ব্যাহত হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাস দুটির এই ত্রুটিগুলি ও পরম্পরাহীন বিশ্বাসের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তবে এই আলোচনা করবার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র -পূর্ব বাংলা উপন্যাস সম্বন্ধে সামান্য আলোচনার অবশ্যই প্রয়োজন আছে।

বাংলা উপন্যাসের জন্মের ইতিহাস খুব প্রাচীন একথা বলা চলে না। বাংলা মঙ্গলকাব্য, ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গগীতিকা এবং আরাকানি গল্প সাহিত্যে বাংলা উপন্যাসের কিঞ্চিত পূর্ব- সূচনা হয়েছিল বলে অনেক সমালোচক মনে করেন। বাংলার লৌকিক গল্পকথা, রূপকথার মধ্যেও উপন্যাস সাহিত্যের অতি ক্ষীণ ও বিস্ময়কর উপাদান পাওয়া যায়। বস্তুতঃ প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যেও রূপকথাই অবাস্তবতা সত্ত্বেও উপন্যাসের দিকে সর্বাপেক্ষা প্রথম অগ্রসর হয়েছে। অন্ততঃ দুটি দিক থেকে উপন্যাসের সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, এর আখ্যান বা গল্পকথা যা মূল বিষয়বস্তু সেটি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য, মঙ্গলকাব্যসমূহের মত কোন ধর্মতত্ত্ব প্রচার বা দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা নয়। দ্বিতীয়ত, এই প্রাচীন সাহিত্য, রূপকথা বা গীতিকাগুলির মধ্যে যথেষ্ট অপ্রাকৃত বা অলৌকিকতা থাকলেও যে লেখক শুধু কল্পিত মায়া-মোহ বা ইন্দ্রজালের একটি ঘন প্রলেপই সৃষ্টি করেননি বরং এতে সাধারণ মানুষের লৌকিক ও সামাজিক বা ব্যবহারিক জীবনের কাহিনীই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তবে এই সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে বাস্তবতার সাক্ষাৎ মিললেও নভেল বা উপন্যাস লেখা এমন এক উচ্চাঙ্গের শিল্প সৃষ্টি যা আধুনিক জীবনবোধের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সমকালীন জীবন সম্বন্ধে বাস্তব আগ্রহ বা অভিজ্ঞতা না থাকলে উপন্যাস সৃষ্টি করা সম্ভবপর নয়। এই আধ্যাত্মিকতা-বিমুক্ত বাস্তবজীবন সাহিত্যে সন্নিবিষ্ট করার প্রতিভা ইংরেজি সভ্যতা ও ইংরেজি সাহিত্যের দান বলেই স্বীকার করা হয়। এর পূর্বে বুদ্ধদেব বা চৈতন্যদেবও সমকালের প্রতি কৌতূহল বা আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন সত্য, কিন্তু সেই চেতনার মূলে ছিল ধার্মিক বাতাবরণ। তাই ধর্মকে অতিক্রম করে বাঙালির সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়নি। বাংলা উপন্যাসের উৎপত্তি ঊনিশ শতকেই সম্ভবপর হয়েছিল তার কারণ বাংলায় রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ফলে বাংলার সমাজের বিবিধ ও বিচিত্র বিকাশ সাধিত

হয়েছিল। রামমোহন রায়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় সতীদাহ প্রথা বিলোপ আইন, তৎপরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণায় বহুবিবাহ বন্ধের আইন প্রচার ও বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য শাস্ত্রীয় ও আইনানুগ সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণ, সর্বোপরি ইংরেজি শিক্ষায় বাঙালির আগ্রহ, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতিবান ব্যক্তিদের সামাজিক মেলামেশা, আদান-প্রদানের মাধ্যমে বাঙালি সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিল। ফলে ব্যক্তি ও সমাজের জটিল স্বরূপ অনুধাবনের প্রয়াস দেখা দিল। তখনই সাহিত্যক্ষেত্রে উপন্যাসের উদ্ভব সম্ভবপর হলো। কাজেই উপন্যাস কেবল গল্প বা কাহিনী নয়, তাতে আছে জীবনচেতনা বা জীবনের বিবিধ বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা। জীবনকে তার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে সামগ্রিকভাবে দেখাবার প্রয়াসই উপন্যাসের মূল বৈশিষ্ট্য। এক কথায় বলতে গেলে সাধারণ বা প্রান্তিক, প্রতিপত্তিশালী বা ধনিক শ্রেণি যেমন চরিত্রই হোক না কেন, তাদের দৈনিক বা ব্যবহারিক জীবন লেখকের অনুভূতির জারকরসে জারিত করেই একটি নির্দিষ্ট ধারণা ঘটানোই উপন্যাসের প্রধান কাজ।[১]

উপন্যাসের এই বৈশিষ্ট্যের কথাটি মনে রাখলে হেনা ক্যাথরিন মুলেন্সের "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ" (১৮৫২) এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল"কে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বলে মান্য করা যায় না।"ফুলমনি ও করুণার বিবরণ" খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্যপ্রচারমূলক কাহিনী মাত্র। এতে দরিদ্র গৃহস্থ পরিবারের জীবনচিত্র আছে বটে, কিন্তু তাতে বাংলার শহরের বা গ্রামের কোনও বিশেষ সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়নি। ফলে কাহিনীর বাস্তবতাও খন্ডিত হয়েছে। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেই যাদুমন্ত্রের মতো দরিদ্র দূরীভূত হয়ে যাবে। এই বিশেষ মনোভাব গ্রহণ করার ফলে গ্রন্থটি ধর্মীয় সাহিত্যের মত প্রচারমূলক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) -এ সমাজ চিত্র অপেক্ষাকৃত পূর্ণতর ও বিষয়বৈচিত্র্যে ভরা, কলকাতার ইংরেজি শিক্ষা, নব্য ইংরেজি নবিশদের চাল-চলন, বিদেশী আদব-কায়দা, কলকাতার আদি বৃত্তান্ত, বৈদ্যবাটীর বাজার জমিদার ও নীলকর সাহেবদের অত্যাচার, প্রজাদের দুর্দশা, সমাজের সৎ ও অসৎ ব্যক্তি, চাটুকার প্রভৃতি অসংখ্য চরিত্রের বর্ণনায় স্পষ্ট যে, লেখক সমগ্র সমাজজীবনের পরিচয় পেতে ও দিতে উৎসুক। এই উপন্যাসের নায়ক- চরিত্র নিমচাঁদ বা নিমে এবং অন্যান্য চরিত্রগুলিও বাস্তব ও রস সমৃদ্ধ। ঠকচাচা

চরিত্রটি তো কালজয়ী স্থায়িত্ব লাভ করেছে। ভাষাভঙ্গিতেও বাস্তবতা ও সরসতার সঞ্চার করে নবজাগ্রত জীবন ও কৌতূহলের পরোক্ষ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

কিন্তু এত উদ্যোগ সত্ত্বেও ‘আলালের ঘরের দুলাল’-কে উপন্যাস বলা চলে না। জীবনের বহুবিধ পরিচয় থাকলেও সেগুলিকে ঐক্যবদ্ধভাবে বিবৃত করে সামগ্রিক রসসৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছেন, এখানেও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিই জয়লাভ করেছে। লেখকের আসল উদ্দেশ্য ছিল গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষা দান। "সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ" প্রবাদটি প্রমাণের জন্যই লেখক কুকীর্তি চিত্রণে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। এছাড়া যে সংঘাত বা অসঙ্গতি ব্যক্ত করা হয়েছে তা বহিরঙ্গের প্রকাশ মাত্র, মানুষের অন্তর্জগতের গভীরতর সংঘাতের কোনও রূপ এতে পরিস্ফুট হয়নি। এই প্রসঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "স্বপ্ন প্রয়াণ" ও "অঙ্গুরীয় বিনিময়"এই দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাসেরও উল্লেখ করা হয়।তবে মূলতঃ প্রাবন্ধিক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস দুটিতে গল্প নির্মাণ শক্তি ছাড়া অন্য কোনও ঔপন্যাসিক লক্ষণ দেখা যায় না। "অঙ্গুরীয় বিনিময়"-এ রোসিনারা ও শিবাজীর প্রণয়ে আদি-অন্ত-সম্বন্ধিত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু উপন্যাস যেহেতু কাহিনী বা গল্পমাত্র নয়, উপন্যাসের ব্যাপ্তি ও সংজ্ঞা ভিন্নতর-তাই এই দুটি গ্রন্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়।[২]

বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দুর্গেশনন্দিনী’, ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। শুধু তাই নয়, বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা বলে অনেকেই সম্মান প্রদান করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সমূহকে প্রধানতঃ তিনটি বিভাগ বা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। ইতিহাসাশ্রিত, সামাজিক ও উদ্দেশ্যপ্রধান। ‘দুর্গেশনন্দিনী’, ‘কপালকুণ্ডলা’, ‘মৃণালিনী’, ‘চন্দ্রশেখর’, ‘রাজসিংহ’ ইত্যাদি উপন্যাসগুলি ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স। ‘কপালকুণ্ডলা’ (১৮৬৬) রোমান্স হলেও তা বঙ্কিমচন্দ্রের কবিত্ব প্রতিভার অপূর্ব সৃষ্টি ও কবিত্বপূর্ণ ভাষার জন্য ‘কপালকুণ্ডলা’ বাংলা উপন্যাসের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। ‘চন্দ্রশেখর’ (১৮৭৪) উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র গার্হস্থ্য জীবন ও রাজনৈতিক ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্ক সুচারুভাবে পরিস্ফুট করেছেন। রাজনৈতিক অরাজকতা ও অস্থিরতা চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী-প্রতাপ এবং দলনী ও মীরকাশেম এই দুটি আখ্যায়িকাকেই সমভাবে প্রভাবিত করেছে। তাছাড়া শৈবলিনী চরিত্র সৃষ্টিতেও তিনি উচ্চাঙ্গের কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

চরিত্রটির পরিণতি শিল্পসংগত হয়নি সত্য, কিন্তু সামগ্রিকভাবে শৈবলিনী চরিত্রটি পাঠককে বঙ্কিমচন্দ্রের নারী চরিত্রগুলির মধ্যে একটি ব্যক্তিত্বময় সংজ্ঞা নির্দেশ করে। 'রাজসিংহ' (১৮৮২) উপন্যাসে ঐতিহাসিক উপাদান এবং ঐতিহাসিক গতির তীব্রতা লক্ষ্য করা যায় বলে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থটিকে তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে ঘোষণা করেছিলেন। প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) -এর তুলনায় এই উপন্যাসগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক তথা ঔপন্যাসিক প্রতিভা অধিক পরিমাণে পরিণত বলে স্বীকার করা যায়।

'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮০), 'সীতারাম' (১৮৮৭) উপন্যাস তিনটিতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রিয় অনুশীলন তত্ত্ব ও ভাবাদর্শ প্রচার করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ফলে তিনটি উপন্যাসের জীবনধর্ম নানাভাবে ক্ষুন্ন হয়ে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য প্রচারের সহায়ক হয়েছে। তা না হলে 'আনন্দমঠ' এর প্রারম্ভ অংশে দুর্ভিক্ষের বাস্তব বর্ণনা সন্তানদলের পরহিতব্রতী আদর্শ, সত্যানন্দ, শান্তি, কল্যাণী, ভবানন্দ, জীবানন্দ চরিত্র প্রভৃতিতে ঔপন্যাসিক সম্ভাবনার সমস্ত উপকরণই বর্তমান ছিল। এই তিনটি উপন্যাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যর্থতা পুরিস্ফুট হয়েছে "দেবী চৌধুরাণী" উপন্যাসে । প্রফুল্লরূপী দেবী চৌধুরাণী কে স্বয়ং ঈশ্বরীরূপে প্রদর্শিত করবার প্রয়াস নানা অসংগতিতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তুলনামূলকভাবে 'সীতারাম' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা প্রশংসনীয়। সীতারামের রূপজ মোহ তার ট্রাজেডিকে কিভাবে অনিবার্য করে তুলল তারই সুন্দর মনোবিশ্লেষণ উপন্যাসটিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রই দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও বাংলা উপন্যাসকে প্রথম সমকালীন জীবনজিজ্ঞাসা দ্বারা তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। তিনিই প্রথম বাস্তব মানুষের জীবনযন্ত্রণা, কামনা বাসনা, বিফলতাকে শিল্প সৌন্দর্যে বিধৃত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

'রজনী' (১৮৭৭), 'ইন্দিরা' (১৮৭৩) এই দুটি উপন্যাসে, উপন্যাসের একটি নতুন আঙ্গিক পরিবেশন করা হয়েছে। "রজনী" উপন্যাসে প্রকৃত বিষয় অন্ধ ফুলওয়ালি রজনী ও শচীন্দ্রের প্রেম নয়, প্রধান বিষয় অমরনাথ- লবঙ্গলতার অসামাজিক প্রণয় সম্পর্ক। যদিও সামাজিক অনুশাসনের জন্য এই প্রণয় চরিতার্থতা লাভ করতে পারেনি কিন্তু উভয়ের অন্তরেই সেই প্রণয়-বহ্নিশিখা চির অনির্বাণ হয়ে

গভীর অন্তর্দাহের সৃষ্টি করেছে। রোমান্সের কুহেলি আবরণ সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে মানুষের জীবনউত্তাপ সঞ্চারিত করেছেন। নীতিবাদী হয়েও আধুনিক মানুষের স্খলন-পতনকে সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন।

"ইন্দিরা" উপন্যাসের ধনী পরিবারের একজন অপহৃতা ও সমাজ পরিবার পরিত্যক্তা বিবাহিতা রমণী কিভাবে পুনরায় স্বামীর সঙ্গে মিলিত হলো তারই ইচ্ছাপূরণের গল্প। বাস্তব জীবন, সামাজিক অবস্থান, রসবোধ সর্বোপরি ইন্দিরার অদম্য ইচ্ছাশক্তি সমস্ত প্রতিকূলতা ও সামাজিক অনুশাসনের সঙ্গে লড়াই করে স্বীকৃতি লাভ করেছে। পারস্পরিক ঘটনার কিছু অসংগতি থাকলেও উপন্যাস হিসেবে এটি উত্তীর্ণ হতে পেরেছে বলে স্বীকার করা যায়।

‘বিষবৃক্ষ’ (১৮৭২) ও কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮) বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস। বিষবৃক্ষ-এ প্রথম বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সের কল্পলোক থেকে সমকালীন বাস্তব সমাজ ও সংসারে পদার্পণ করলেন। এখানে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বের আধুনিক জটিল সমস্যা বা পারিবারিক সমস্যা বিস্তৃতভাবে রূপায়িত হল। নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর দাম্পত্যজীবনে কুন্দনন্দিনীর আবির্ভাব ও তিরোভাব যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার একটি মনোজ্ঞ চিত্র উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। তাছাড়া দেবেন্দ্র-হীরার একটি অসামাজিক সম্পর্ক গৌণ আখ্যায়িকার মাধ্যমে ও মানবজীবনে বা সমাজে ধনী -নির্ধন নির্বিশেষে ইন্দ্রিয়-পিপাসার ট্রাজেডি সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হয়েছে।‘বিষবৃক্ষ’-এ পারিপার্শ্বিক কাহিনীর পটভূমিকায় নগেন্দ্রর পারিবারিক জীবনের কাহিনী, দেবেন্দ্র-হীরার মাধ্যমে গ্রাম্যসমাজ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এ উপন্যাসে হীরা, দেবেন্দ্র, কুন্দনন্দিনীর চরিত্র সৃষ্টিতে লেখক দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন।[৩]

"কৃষ্ণকান্তের উইল"ই বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে অধিকাংশ সমালোচক অভিমত প্রকাশ করেছেন। বিশ্লেষণের মনোজ্ঞ ও সমাজ এবং সমস্যাচিত্রণে অধিক সফলতা-এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বর্ণনার বহুল্য নেই, উপকাহিনীর প্রয়োজনীয়তা নেই, একটি গল্পকথা

বা কাহিনী অনিবার্য বেগে সীমাহীন ট্রাজিক পরিণতির দিকে ধাবিত হয়েছে। রোহিণীর অন্তিম পরিণতি কি তা রোহিণীর অজ্ঞাত ছিল, গোবিন্দলালও দুর্বলচিত্ত রূপমোহমুগ্ধ পুরুষের মতো তার দিকে ধাবিত হয়েছে। আর ভ্রমরের স্বামীর প্রতি অভিমানও এই ট্র্যাজিক পরিণতির জন্য দায়ী। চরিত্রগুলির মানসিক দ্বন্দ্ব রূপায়ণে বঙ্কিমচন্দ্র অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশেষতঃ নারীজাতির স্ববিরোধী মতামত, কোন্দল, ঈর্ষাপরায়ণতা সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে। এভাবে এই উপন্যাসে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগত একটি অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত হয়ে নূতনতর তাৎপর্যে মন্ডিত হয়েছে।

কিন্তু একই সঙ্গে এ কথাও উপলব্ধি করা যায় যে, এই দুটি উপন্যাস মাত্রাতিরিক্ত নীতিবোধের দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়েছে। নগেন্দ্র চরিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই তা প্রমাণিত হতে পারে। নগেন্দ্র সুপুরুষ অবস্থাসম্পন্ন, রুচিশীল ও পত্নী প্রেমিক। তার রুচিশীলতার ও ভদ্রতার এবং মানবিকতার প্রথম প্রয়াস দেখা যায় উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের প্রতিটি পরিচ্ছেদের একটি করে বিষয়বস্তুসূচক শিরোনাম আছে যা এই উপন্যাসের কৌশল এর মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন।

"এদিকে নগেন্দ্র প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া গ্রামস্থ সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'এই মৃত ব্যক্তির কন্যার কি হইবে ? সে কোথায় থাকিবে? তাহার কে আছে? ইহাতে সকলেই উত্তর করিল যে উহার কেহ নাই।'তখন নগেন্দ্র কহিলেন তবে তোমরা কেহ উহাকে গ্রহণ করো। উহার বিবাহ দিও। তাহার ব্যয় আমি দিবো। আর যতদিন সে তোমাদের বাটীতে থাকিবে ততদিন আমি তাহার ভরণপোষণের ব্যয়ের জন্য মাসিক কিছু টাকা দিব।.....নগেন্দ্রকে নিরুপায় দেখিয়া একজন বলিল 'শ্যামবাজারে ইহার এক মাসির বাড়ি আছে। বিনোদ ঘোষ ইহার মেসো। আপনি কলিকাতায় যাইতেছেন, যদি ইহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া সেইখানে রাখিয়া আসেন, তবেই এই কায়স্থ কন্যার উপায় হয় এবং আপনারও স্বজাতির কাজ করা হয়। অগত্যা নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে কলিকাতায় আত্মসমভিব্যহারে লইয়া আসিলেন। প্রথমে তাহার মেসো বিনোদ ঘোষের অনেক সন্ধান করিলেন।

শ্যামবাজারে বিনোদ ঘোষ নামে কাহাকেও পাওয়া গেল না। এক বিনোদ দাস পাওয়া গেল-সে সম্বন্ধ অস্বীকার করল। সুতরাং কুন্দ নগেন্দ্রের গলায় পড়িল'।[৪]

পরবর্তীকালে নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করলেও স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারেনি কারণ তার পতিপ্রাণা স্ত্রী সূর্যমুখীকে সে যথার্থই ভালোবাসতো। একই সঙ্গে দুই সহধর্মিনীকে গৃহলক্ষ্মীরূপে গ্রহণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না, যদিও সেই সময় হিন্দু সমাজে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে বহুবিবাহ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে ও বিধবা বিবাহের প্রচলন হয়। অবশেষে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিধবা বিবাহের সমর্থনে আইন পাশ হয়। এই উপলক্ষ্যে এই দেশে বহু বাকবিতন্ডা বা তর্কযুদ্ধ হয়। বাংলার বিদগ্ধ সমাজ ও ব্যক্তিগণও এই বিতর্ক থেকে মুক্ত হতে পারেননি। সম্ভবত এই বিষয়ে বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে দুটি ভিন্ন মতবাদ প্রকট হয়ে ওঠে। স্বয়ং বিদ্যাসাগর পরাশর সংহিতা, মনুসংহিতা ও অন্যান্য শাস্ত্র থেকে উদ্‌ধৃত করে বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে জনমত গঠন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রও এর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। তাই আলোচ্য উপন্যাসে স্বামীহারা কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র বিবাহ করেছে এই ঘটনা তিনি মেনে নিতে পারেননি। অথচ এই সমস্যাটিকে তিনি মানসিকভাবে পরিহারও করতে পারেননি। ‘বিষবৃক্ষ’ মনস্তত্ত্বমূলক সামাজিক উপন্যাস সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র এতে ব্যক্তিগত ক্ষোভও ব্যক্ত করেছেন। এই বিষয়ে তাঁর পারিবারিক অভিজ্ঞতার প্রতিফলনও ঘটেছে। প্রথমত ‘বিষবৃক্ষে’র নাম, পরিচ্ছেদের শিরোনাম, প্রথম থেকেই আখ্যানের পরিকল্পনা, সুবিন্যস্ত ঘটনা, ভবিষ্যত ঘটনার সম্ভাবনার বীজস্বরূপ অলৌকিকতা প্রদর্শন, প্রেরণা, নীতিকথা, রিপুর প্রাবল্য, ঘটনাবলী মৃত্যুফলদায়ী বিষবৃক্ষে পরিণত হয় কিভাবে, তা সুশৃঙ্খলভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে।

‘বিষবৃক্ষ’ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন বন্ধুবর্গ বা পরিচিতরা অনেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখী সম্বন্ধে তাঁদের আগ্রহ ছিল। এই দুটি নারী চরিত্র সম্বন্ধে আগ্রহের কারণ এই যে, এরা কেউ লেখকের পরিচিত কোন চরিত্রের প্রতিভূ কিনা! কবি নবীনচন্দ্র সেন ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বিবরণ সম্বন্ধে এ বিষয়ে আলোকপাত করা

যেতে পারে। নবীনচন্দ্র সেন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন ১৮৭৭ সালে। প্রারম্ভিক পরিচয় পর তিনি নিজের কিছু লেখা বঙ্কিমচন্দ্রকে পড়ে শোনান। বঙ্কিমচন্দ্রও অনুরোধ করেন তাঁর লেখা থেকে নবীনচন্দ্রও যেন কিছু পাঠ করেন। অক্ষয় চন্দ্র সরকারের আগ্রহে নবীনচন্দ্র "বিষবৃক্ষ" থেকে পড়ে শোনান — "তিনি 'বিষবৃক্ষ' খুলিয়া, যেখানে কমলমনির কাছে সূর্যমুখী তাঁহার পতিপ্রাণতা দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছেন, সে স্থান পড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন—'বিষবৃক্ষ' আমি পড়িতে পারি না। তুমি অন্য কিছু শুনিতে চাও ত পড়ি'। আমাকে অক্ষয়বাবু সত্যই বলিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর চরিত্রই তাঁহাকে "নভেলিস্ট" করিয়াছে, তিনিই সূর্যমুখী।"[৫]

১৮৯৩ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটে। তবে তখন অন্যরকম পরিবেশ। সেই সময় 'বিষবৃক্ষ' সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকদের মধ্যে এই উপন্যাসটির যে সমালোচনা হতো নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর বিস্তারিত বিবরণ দেন যদিও তা গতানুগতিক সাহিত্যপাঠের দৃষ্টিতে, উপন্যাসের শিল্পরীতি বা সাহিত্যভাবনার উচ্চাঙ্গ দৃষ্টিতে অবশ্যই নয় । বঙ্কিমচন্দ্র বিবাহ-বহির্ভূত প্রেমের কাহিনী প্রচার করেছেন, কুন্দনন্দিনীর বিষপানে মেয়েদের আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে ও ঘরে ঘরে সতীসাধ্বী স্ত্রীদের লাঞ্ছনা ঘটবে— সাধারণ পাঠকের সমালোচনার মূলকথা ছিল এটাই। বঙ্কিমচন্দ্র নীরবে এই অভিযোগ গ্রহণ করলেন। অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, ঘরের দেওয়ালে বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারী দেবীর একটি অয়েল পেইন্টিং ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেদিক দৃষ্টিপাত করিয়ে বললেন যে, তাঁর এই আদরের কন্যাটিও কুন্দনন্দিনীর মতই বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। এই মর্মান্তিক শোক কোন পিতার পক্ষে কতখানি কষ্টদায়ক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র আইনের দিক থেকে বিচার করলে হয়তো বলতেন, বিষপান আইনবিরুদ্ধ, কিন্তু মহোদয় পাঠকেরা কুন্দনন্দিনীকে তার সারল্য ও সহনশীলতার জন্য যেমনভাবে আপন করে নিয়েছিল সৃষ্টিকর্তা বঙ্কিমচন্দ্রও তাতে কোনও স্বস্তি পেতেন বলে মনে হয় না। কারণ ব্যক্তিগতভাবে পত্নীপ্রাণা বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে শাস্তি বা শান্তি দিয়ে গৃহলক্ষ্মীরূপে সূর্যমুখীকে যথার্থই হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। নগেন্দ্রনাথের মধ্যে এই দ্বিচারিতাই তার দুর্বলচিত্তের প্রধান কারণ। নগেন্দ্রনাথ বিধবা কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করেছিলেন কেবল সহানুভূতি ও রূপজ মোহের জন্য। কোন সামাজিক সমস্যার সমাধান বা গাঢ় প্রণয়ের জন্য নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমবেদনা নগেন্দ্রনাথের উপর পূর্বাপর বর্ষিত হয়েছে, তার কার্যকলাপকে তিনি যন্ত্রণায়, অনুতাপে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছেন, কিন্তু নগেন্দ্রনাথ কি এই ক্ষমার যোগ্য? অনার্জিত জমিদারী, অনায়াসলব্ধ ধন-সম্পত্তি, পূর্বপুরুষ দ্বারা অর্জিত প্রতিষ্ঠা-সম্মান, বিলাসবহুল জীবন, সূর্যমুখী মতো পতিনিষ্ঠা স্ত্রী নগেন্দ্রনাথ লাভ করেছে-কিছুই তাকে বিদ্যাবুদ্ধি বা শ্রম দ্বারা অর্জন করতে হয়নি। গতানুগতিক নিয়মে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে; এমনকি কুন্দকেও তার অনায়াসলব্ধ একটি ভোগ্যপন্য হিসেবে লাভ করেছে। তবে কুন্দের রূপজমোহতেই প্রথম নগেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন জীবন ও তার যন্ত্রণা, তার জন্মায়ত্ত জমিদারীর মত সহজলভ্য নয়। সেখান থেকেই তার জীবনচেতনার জন্ম- ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা, যন্ত্রণার আস্বাদন। সূর্যমুখী গৃহত্যাগ না করলে তার দ্বিত্ব জীবনবোধ আন্দোলিত হতো কিনা সন্দেহ আছে। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ তার মনে এক অপরাধবোধের জন্ম দেয়, যা সূর্যমুখীর অন্বেষণে যেতে তাকে বাধ্য করে; অথচ একটি বারের জন্যও সদ্য পরিণীতা কুন্দনন্দিনীকে স্মরণ করে না। কিন্তু এই কুন্দনন্দিনী জীবৎকালে অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা ও মানসিক ক্লেশ, স্বল্পায়ু পূর্ব-বিবাহিত জীবন যা প্রায়শই অবহেলা ও অনাদরের কারণ ছিল তা প্রাপ্ত হয়েছিল। নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন তার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে তখন সে মৃতপ্রায় পিতার পার্শ্বে উপস্থিত ছিল সে সময় তার গৃহের অবস্থা ও অব্যবস্থা নগেন্দ্রনাথের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। কিন্তু ঐ সময় স্বল্পালোকিত ঘরেও কুন্দের ‘এক অনিন্দিত গৌরবকান্তি স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়পিনী বালিকা’র রূপ সৌন্দর্যও নগেন্দ্রনাথের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। এই রূপজ মোহই নগেন্দ্রের চরিত্র- স্খলনের যথেষ্ট কারণস্বরূপ ছিল। আবার কুন্দকে বিবাহ করার পর তাকে অবহেলায় দূরে সরিয়ে রেখে সূর্যমুখীর অন্বেষণে গৃহত্যাগ, অনুশোচনা, প্রত্যাবর্তন, অনুতাপ, আবেগ-অধীরতা- এই সুদীর্ঘ সময়ে সত্যিই আত্মদংশনের ও জীবনযন্ত্রণার ছবি আছে। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগে সরাসরি কুন্দকে দায়ী করেছেন। "তোমার মুখে সূর্যমুখীর নাম শুনিলে আমার অন্তর্দাহ হয়, তোমারই জন্য সূর্যমূখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল’—(একত্রিংশতম পরিচ্ছেদ)। বিবাহিত নগেন্দ্রনাথ কি কুন্দকে বিবাহ করে অনুতপ্ত হয়েছিলেন? একই সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর জন্য আকুলতা, পরক্ষণেই সূর্যমুখীর জন্য বিরহ-কাতরতা--চরিত্রের এই দ্বিচারিতা নগেন্দ্রনাথের চরিত্রের প্রধান ত্রুটি।[৬] ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র বহুবিবাহকে কি সমর্থন করেছেন অথবা বিধবা বিবাহকে অসঙ্গত মনে করেছেন তা স্পষ্ট নয়। বিধবা বিবাহ আইন পাশের পর যে সমস্ত যুবক বিধবা বিবাহ করেছিলেন তারা অধিকাংশই অবিবাহিত ছিলেন। এমনকি স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও তাঁর পুত্রের বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন। যদিও পরে এই ঘটনা নিয়ে তাঁর

পরিবারে বহু বাকবিতন্ডা হয়। তাই সমাজসংস্কারক বিদ্যাসাগর ও ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক হওয়াই স্বাভাবিক। তাই "বিষবৃক্ষে" নগেন্দ্রনাথ পরিশোধিত হয়েছেন, কিন্তু স্বকৃত জীবন-জটিলতার ও ভাব -সংকটের কতটা চেতনালাভ নগেন্দ্রনাথের হয়েছে তা চিন্তা করার অবকাশ আছে। নগেন্দ্রনাথের দুই স্ত্রী নিয়ে সমস্যা তার একান্ত নিজের, তিনি নিজেই এই সমস্যার জন্য দায়ী। তাই বহিরঙ্গের সমস্যার অপেক্ষা অন্তর্দ্বন্দ্ব অধিক পরিমাণে ঘটেছে। যে কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করার জন্য তিনি বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেছেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের যুক্তি দেখিয়েছেন, হরদেব ঘোষালকে পত্র লিখেছেন- এসবই আত্মদংশন বা বিবেক বুদ্ধির প্রাণক্ষয়ী দ্বন্দ্ব। সূর্যমুখীকে অন্বেষণ, তার বিরহে আকুলাবস্থা সবই সংযমহীনতার প্রতীক। একবারের জন্যও অবনতা, চিরদুঃখী কুন্দনন্দিনীর কথা স্মরণে আসেনি, এমনকি কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর সময় একবারের মতো কুন্দর মুখে কথা শোনা গেল "কাল যদি তুমি একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে, কাল যদি একবার আমার নিকটে এমনই করিয়া বসিতে তবে আমি মরিতাম না" (৪৯তম পরিচ্ছেদ)

নগেন্দ্র বা সূর্যমুখীর মনে এই মর্মভেদী কথা কোন প্রভাব ফেলতে পেরেছিল তা মনে হয় না বরং কোনও তৃতীয় ব্যক্তি বা নারীর ছায়া তাদের দাম্পত্যজীবনের মধ্যে থাকুক এমন সম্ভাবনা বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করেননি। বরং সূর্যমুখীকে "একমেবাদ্বিতীয়ম" পত্নীরূপেই অঙ্কিত করেছেন। কুন্দর শেষ মুহূর্তের যন্ত্রণাক্লিষ্ট হাসিটিই নগেন্দ্রনাথের হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল। কুন্দর সেই অপাপবিদ্ধ আত্মদানের হাসি।[৭]

মনোবিজ্ঞান বলে, জীবন সব যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতির বিস্মরণ ঘটায়-এ কথা একটি রূঢ় সত্য। তবে এক্ষেত্রে নগেন্দ্রর জীবনে বা স্মৃতিতে কুন্দর ভূমিকা কি সত্যিই ছিল? জীবনের এই অগ্নিদাহ তার মনুষ্যত্বকে কতটা অগ্নিশুদ্ধ করে রেখে গিয়েছিল উপন্যাসে তার কোন উল্লেখ নেই। নগেন্দ্রর আত্মদহন কি যথার্থ উপলব্ধির কারণ হয়েছিল? বিষবৃক্ষের বিষ নগেন্দ্রনাথের কণ্ঠ বা চক্ষুকে স্পর্শ করেছে মাত্র, চৈতন্যকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাই 'বিষবৃক্ষ' সামন্ততান্ত্রিক জমিদার সমাজের আরোপিত ও পালিত কাহিনী বললে অন্যায় হয় না। তবে এটি একটি স্থূল ব্যবহারিক ব্যাখ্যা। 'বিষবৃক্ষ' আরও অনেক কিছুর প্রতীক। কুন্দ-সূর্যমুখী হীরার মাধ্যমে ফিউডাল সমাজের গতিপ্রকৃতি জানা যায়। নগেন্দ্রর মধ্যে চারিত্রিক উন্নতি পরিপূর্ণ হবার পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কাহিনী সমাপ্ত করেছেন। তা না হলে হয়তো নগেন্দ্রনাথের চরিত্র সম্পূর্ণতা লাভ করতো। [৮]

সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী- এই দুটি চরিত্রও যথেষ্ট আকর্ষক। "সূর্য্যমুখী পূর্ণচন্দ্রতুল্য তপ্তকাঞ্চনবর্ণা... সূর্যমুখীর চক্ষু সুদীর্ঘ, অলকস্পর্শী ভ্রুযুগসমাশ্রিত, কমনীয় বঙ্কিমপল্লবরেখার মধ্যস্থ স্থূল কৃষ্ণ মণ্ডলাংশের আকারে ঈষৎস্ফীত, উজ্জ্বল অথচ মন্দগতি বিশিষ্ট।" বর্ণনা অনুসারে সূর্যমুখী সুন্দরী তবে তার সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বের চেয়েও অধিক আকর্ষণীয় তার পতিপ্রেম। সূর্যমুখী সুগৃহিনী, মর্যাদাসম্পন্ন, স্বগৃহে সে সম্মানিতা সহৃদয়া, বুদ্ধিমতী, সহজভাবেই সুগৃহিণী। আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পণে যে বাঙালি স্ত্রীদের ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়, বঙ্কিমচন্দ্র তা স্বীকার করেছেন। তাই অকপটে মন্তব্য করেছেন— "এদেশে স্ত্রীরাই মানুষ"। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি সম্পদের এক সামাজিক তাৎপর্য -তাঁর নারী চরিত্রগুলি। কল্পনা ও আদর্শ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সামাজিক জীবনে নারীর নতুন আদর্শ বাস্তবে সত্য করে তোলা সম্ভব হতো না যদি না বাস্তব সমাজ নারীর জন্য সেরূপ ক্ষেত্র তৈরি করে না তুলতো। ঐতিহ্যের সঙ্গেই নতুন ধারণা বা সমস্যাকে যুগপযোগী করার লক্ষ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের নারীরা যথেষ্ট সচেষ্ট। সূর্যমুখীও তার ব্যতিক্রম নয়। একদিকে অসাধারণ ও নিষ্কলুষ পতি অনুরাগিনী, অপরদিকে স্বামীর ঐকান্তিক ইচ্ছাকে সম্মানের সঙ্গে মান্যতা দিতে সূর্যমুখী নিজের সঙ্গে অবিরত মনস্তাত্ত্বিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। পরিশেষে স্বামীর ইচ্ছাকেই ফলবতী করেছে। নগেন্দ্রনাথ যে কুন্দনন্দিনীতে আসক্ত, সর্বপ্রথম এই ঘটনাটি সূর্যমুখী অন্তর দিয়েই অনুধাবন করতে পেরেছিল। স্বামীর আচার-আচরণের পরিবর্তন বা মানসিক দ্বন্দ্ব তার অগোচরে থাকেনি। কমলমনিকে লেখা তার চিঠিপত্রাদির মধ্যেই তা পরিস্ফুট হয়েছে। নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর বিবাহের পর তার গৃহত্যাগ শুধু অভিমান নয়, বরং প্রেমাস্পদর জন্য আত্মদানও বটে। সূর্যমুখীর প্রেম নতুন চেতনা ও ভালোবাসা সম্বন্ধে নতুন মানসিকতার জন্ম দেয়। মনে রাখতে হবে যে, তখনকার বাঙালি সমাজ ছিল মূলতঃ গ্রাম প্রধান। এই সমাজের গতানুগতিক জীবনযাত্রায় রাজনৈতিক যুদ্ধবিগ্রহ কখনো বড় ব্যাপার হয়নি। সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজ বা বিত্তশালী সম্প্রদায় রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও নিরুপদ্রবে জীবন যাপন করতো। নারীরা এই শান্ত পরিবেশে ব্রত, উপবাস, "বারো মাসে তেরো পার্বণ" উৎসব-আনন্দে সংসারে পরিবার-পরিজন নিয়ে স্বচ্ছন্দে বসবাস করত। এই সংসার যাত্রা নির্বাহ করতে করতে একটি সহজ সামঞ্জস্যময় জীবনের

অধিকারিণী হত। নারীরা অধিকার, স্বাতন্ত্র্য, সচেতনতা রক্ষার চেষ্টার থেকে সংসারের সেবায় আত্মনিয়োগ করাকে তুলনামূলকভাবে শ্রেয় বলে মনে করতেন। পল্লী জীবনযাত্রার পরিবেশে বাঙালি সংসার যাত্রা ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহতই ছিল। মধ্যবিত্ত সংসারে গৃহ সহায়িকা বা পরিচারিকারাও গৃহে সদস্য রূপেই পরিগণিত হতো। কখনও কখনও পুরুষানুক্রমেও তাদের সেবাকার্যে ব্যাপৃত থাকতে দেখা যেত।

কদাচিৎ কোনও ভাগ্যবঞ্চিতা রোহিণী বা মন্দভাগিনী হীরা দেখতে পাওয়া যেত একমাত্র ব্যতিক্রম রূপে। তাই সূর্যমুখীর চরিত্রও ঐতিহ্যবাহী বাঙালি গৃহস্বামিনী রূপেই মর্যাদা প্রাপ্তা। তবে সূর্যমুখীর আচরণেও দ্বিত্ব সত্তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নগেন্দ্রনাথের ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে কুন্দকে বিবাহ সে অনুমোদন করেছে সত্য, কিন্তু পরক্ষণেই মনোকষ্টে গৃহত্যাগও করেছে। সেটা কি সতীন –জ্বালা, ঈর্ষা বা অনাদর একথা পরিষ্কারভাবে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্ত করেনি। প্রাণাধিক প্রিয় স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ কোন স্ত্রীই অনুমোদন করতে পারেন না, বহুবিবাহের ফলে সংসারের যে বিশৃঙ্খলা বা অনর্থ ঘটে থাকে তা সমাজের স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করে, পারিবারিক সংকট দেখা দেয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটে, সামাজিক জীবনেও অনেক অসুবিধা সম্মুখীন হতে হয়, সন্তানাদির পিতৃপরিচয় নিয়ে সংশয় উপস্থিত হয়, মাতুলালয় পালিত পুত্রকন্যারা অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়। সেন রাজত্বের সময়ে যে কৌলিন্য প্রথার প্রচলন ঘটে তাতে এই বহুবিবাহ প্রথা বিস্তার লাভ করে। বহু স্বামীসুখ-বঞ্চিতা নারী বিপথে গমন করে। বহুবিবাহ বঙ্গ সমাজে এক ভয়াবহ সংকটের সৃষ্টি করে। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় বাল্যবিবাহের অবসান ঘটে। বহুবিবাহ ও বিধবা বিবাহেরও প্রচলন হয়। তবে বহু বিবাহের অবসান ঘটাতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পৌঁছতে হয়। সূর্যমুখী বহুবিবাহ বা বিধবা বিবাহের দ্বারা শোষিত বা অবহেলিত হয়েছে একথা বলা যায় না। তার সংসারে দ্বিতীয় নারীর আগমনে সে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে ও গৃহত্যাগ করে। নগেন্দ্রনাথ ও তার প্রণয় অনুরাগ তাঁর গর্বের বিষয় ছিল, কিন্তু নগেন্দ্রর মুখে 'তার প্রতি ভালোবাসা নাই, সুখ নাই' শুনে সে অত্যন্ত বিচলিত হয় ও মনের অস্থিরতা নিরসনে বাইরের জগতে পদক্ষেপ নেওয়ার সংকল্প করে। কিন্তু নগেন্দ্রকে ছাড়া তার জীবন অচল ও অর্থহীন হবে জেনেও বিকল্প পথের সন্ধানে সে গৃহত্যাগ করে, কিন্তু দ্বিতীয় কোন পথের নিশানা তার কাছে ছিল না, কেননা অন্তঃপুরবাসিনী নারীর জীবনধারণের জন্য কোনরূপ বিকল্প ব্যবস্থা তখনকার সমাজ অনুমোদন করেনি, কেবল ভদ্রগৃহে দাসী বা গৃহসহায়িকা ভিন্ন কোন কাজেই তারা যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। কিন্তু সূর্যমুখী অবস্থাপন্ন

পরিবারের গৃহবধূ হওয়ার জন্য কোন ভদ্রেতর কর্ম গ্রহণ করতে পারেনি বা গ্রহণ করেনি। তার অন্তঃকরণ সর্বদাই নগেন্দ্রময় ছিল, তাই আবার সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে নগেন্দ্রর দাম্পত্যজীবন কেমন ভাবে অতিবাহিত হয়ে চলেছে সেই নারীসুলভ ঈর্ষা ও কৌতূহল তার মনে ছিল। এছাড়া নগেন্দ্রর প্রতি তার একনিষ্ঠ প্রেমও এই অবস্থার জন্য দায়ী। নগেন্দ্রও তার অনুসন্ধানে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসায় বেদনার্ত ছিল। তাই সূর্যমুখীর প্রত্যাবর্তনে নগেন্দ্রর প্রণয় ও অনুরাগ দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এলো। দীর্ঘ বিরহের পর প্রেমিক-প্রেমিকা বা দম্পতি যেমন পূর্ব প্রণয়কে নতুনভাবে আস্বাদন করে, এও তেমনই একটি বিষয় -এতে আশ্চর্যের কথা কিছু নেই। কুন্দের মৃত্যুতে আবার নগেন্দ্র সূর্যমুখীর সংসার যাত্রা নতুনভাবে আরম্ভ হল একথা আশা করা যায়, কিন্তু অভাগিনী কুন্দনন্দিনী তার স্বপ্ন-আশা, নতুন সংসারের আনন্দ থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হলো।[৯]

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্ট দুটি নারী চরিত্র বর্তমান যারা উপন্যাসের গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়েছে। এ দুটি নারী চরিত্র হলো কুন্দনন্দিনী ও হীরা। কুন্দনন্দিনী উপন্যাসের মধ্যে পরিস্ফুট হয়নি, কুন্দকলির মতো সে স্ফুটোন্মুখ, কিন্তু সামাজিক প্রতিকূলতায় প্রস্ফুটিত না হয়ে অকালে বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়েছে। কুন্দনন্দিনী যে সুখের আশা কখনো করেনি, তার সে সুখ হয়েছিল-নগেন্দ্রর সঙ্গে তার পরিণয় হয়েছিল। তারাচরণের সঙ্গে বিবাহ তার সুখের বা স্বস্তির কারণ ছিল না, কেননা সূর্যমুখী আপন ইচ্ছায় তার ভাইয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিল। তারাচরণের মৃত্যুর পর নগেন্দ্রর আবাসই তার বাসস্থান ছিল। নগেন্দ্রের হৃদয়ে কুন্দের প্রতি প্রেমানুরাগ কতটা সহানুভূতি বা কতটা সত্য প্রণয়-পিপাসা সে কথা বলা খুবই কষ্টসাধ্য। ঘটনাক্রমে নগেন্দ্রর বিপথগামী ভ্রাতা দেবেন্দ্র এই ঘূর্ণাবর্তে আগমনের পরে সমস্যা অধিকতর সংকটবহুল হয়ে ওঠে। দেবেন্দ্র নারীলোলুপ পুরুষ ও মদ্যাসক্ত, নিত্যনতুন নারীতে অভিগমন করে। এরূপ দুশ্চরিত্র ব্যক্তির কুদৃষ্টি কুন্দর উপর পড়ায় পরিবেশ অনেকাংশে কলুষিত হয়। দেবেন্দ্রর ইচ্ছে ছিল কুন্দনন্দিনীকে করায়ত্ত করে, কিন্তু কুন্দর দিক থেকে কোনরূপ ইঙ্গিত কখনোই আসেনি। তাই দেবেন্দ্র হীরাকে তার লালসা চরিতার্থ করার সোপান বা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিল। অবশ্য দেবেন্দ্রর সেই জঘন্য আশা কোনদিনই পূরণ হয়নি। বরং প্রেমবুভুক্ষু হীরাদাসী দেবেন্দ্রর প্রতি মোহগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল-যা অচিরেই বিফলতা প্রাপ্ত

হয়। আর একটি কথা উল্লেখ করবার মতো যে নগেন্দ্রর প্রতি কুন্দের কি সত্যই কোন হৃদয়াবেগ ছিল? কুন্দের এই অনুরাগ বা প্রেমপর্বটি অপরিস্ফুট হয়ে থেকে গেছে। কুন্দের পিতার মৃত্যুর পর যে অলৌকিক চিত্র প্রদর্শন ঘটে, কুন্দের মাতা- যিনি তখন পরলোকগতা তার সাবধানবাণী যতই ভবিষ্যৎ নির্দেশ করুক না কেন অলৌকিক বলেই তার বিশ্বাসযোগ্যতা সন্দেহাতীত নয়। যদিও নগেন্দ্রর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই কুন্দ যথেষ্ট বিস্মিত হয় ও স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষটি যে তার বিপদের কারণ সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকে, তবে তারাচরণের সঙ্গে বিবাহের পর অপূর্ণ দাম্পত্যের কারণেই কুন্দর নগেন্দ্রর প্রতি এক ধরণের নির্ভরতা জন্মায়। বিধবা কুন্দ সূর্যমুখী ও নগেন্দ্রর সুখী দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত ছিল। তার মনে এই দাম্পত্যে ভাঙন ধরাবার কোনরূপ ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি কোনোভাবেই স্থান পায়নি। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাদের জীবনে কুন্দ একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে ওঠে, ফলস্বরূপ নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর বিবাহ ও সূর্যমুখী গৃহত্যাগের মত অভাবিত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। নগেন্দ্র ও কুন্দনন্দিনীর প্রণয়পর্বও অস্বাভাবিক ও ধারাবাহিকতাহীন যা উপন্যাসের শিল্পসৃষ্টিকে ব্যাহত করেছে। পরিশেষে বিষ পানে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু যেন নগেন্দ্র সূর্যমুখীর দাম্পত্যপ্রেম ও জীবনযাপনকে স্বাভাবিক করার চেষ্টায় আরোপিত বলে মনে হয়। মনে হয় ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র সুখী বিবাহিত জীবনকে প্রেমময় করে দেখাবার জন্যই কুন্দকে বিসর্জন দিলেন। অথচ কুন্দ শেষ পর্যন্ত নগেন্দ্রকে ভালোবেসেছিল। মৃত্যুকালে এসে নগেন্দ্র কে অনুযোগ করল — "কাল যদি একবার আমার নিকটে এমনি করিয়া বসিতে তবে আমি মরিতাম না, আমি অল্প দিন মাত্র তোমাকে পাইয়াছি। তোমাকে দেখিয়া আমার আজিও তৃপ্তি হয় নাই। আমি মরিতাম না। মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে দিদি যদি কখনো ফিরে আসেন তবে তাহার কাছে তোমাকে রাখিয়া আমি মরিব আর তাহার সুখের কাঁটা হইয়া থাকিব না।"[১০]

এখানেই অপরিস্ফুটা কুন্দনন্দিনীর মহত্ব! কুন্দনন্দিনী সরলা কিন্তু স্বার্থপর নয়। তার জীবনের বিয়োগান্তক পরিণতির মধ্যেও সে পাঠকের অন্তরে চিরকাল সজীব হয়ে থাকবে। যদিও উপন্যাস মধ্যে কুন্দনন্দিনীর বয়স মাত্র তেরো বৎসর। ঐ বয়সে প্রেম সম্বন্ধে তার ধারণা কি তাও সম্যকভাবে পরিস্ফুট হয়নি। নগেন্দ্রর বয়স ৩৩ বছর- এই অসম বয়সের ব্যবধান কি তাদের সম্পর্কের একটি বাধাস্বরূপ ছিল? রক্ষণশীল বঙ্কিমচন্দ্রও তার কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। আধুনিক পাঠক এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা করবেন আশা করি।

'হীরা' বিষবৃক্ষের একটি অবধারিত বিষফলস্বরূপ চরিত্র। কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম অংশেই জানা গেল হীরা পদ্মপলাশলোচনা, শ্যামাঙ্গী। গোবিন্দপুর গ্রাম অর্থাৎ নগেন্দ্রগৃহে সে দাসীবৃত্তি করতো। সে বালবিধবা বলেই সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত ছিল, যদিও তার স্বামীদেবতাটিকে কেউ কোনদিনই দেখেনি। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, প্রসাধন পটীয়সী, রুচিশীলা। বয়সে সে অন্যান্য পরিচারিকাগণের থেকেও কনিষ্ঠা কিন্তু বুদ্ধি ও চাতুর্যে সে তাদের মধ্যে 'শ্রেষ্ঠা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল'[১১]। সূর্যমুখী ছদ্মবেশী নগেন্দ্রের তত্ত্বতালাসে তাকে নিযুক্ত করলে সে অচিরেই সে কাজে সফলতা পেলও দেবেন্দ্রর আসল পরিচয় অবগত হয়ে সূর্যমুখীকে সমস্ত সংবাদ দিল। দেবেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের পর কুন্দনন্দিনীর উপর তার আসক্তি অনুভব করে হীরা অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে গৃহত্যাগী কুন্দকে নিজ গৃহে আশ্রয় দিয়েছিল, তা কেবল উদারতা বা মানবিকতার জন্য নয় বরং কুন্দের প্রতি দেবেন্দ্রর আসঙ্গ-লিপ্সা ও সূর্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রর দাম্পত্য প্রেম প্রগাঢ় দেখেই তার স্ত্রীলোকসুলভ ঈর্ষাকাতরতার উদ্ভব হয়েছিল ও এই প্রসঙ্গে সামাজিকভাবে তার অবস্থান ও অন্নদাতাদের পারিবারিক ও সামাজিক আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণও তার মনের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছিল। পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রর কপট ভালোবাসার ছলে তার পদস্খলন হয়। আবাল্য প্রেমপিপাসু হীরা অসৎ চরিত্রের দেবেন্দ্রকে মদ্যপ ও বহুনারীলোলুপ জেনেও আত্মসমর্পণ করে তা কেবল ঈর্ষায় নয়, বরং প্রেমপিপাসায় আত্মবিস্মৃতিও বটে, ফলে দেবেন্দ্রর প্রতি তার অনুরাগ নিজের কার্য চরিতার্থ করবার মাধ্যম বটে, কিন্তু কুন্দের প্রতি দেবেন্দ্রর লালসা সে সহ্য করতে পারেনি। তার নিষ্ফল প্রণয় যন্ত্রনা সে সহ্য করেছিল, কিন্তু দেবেন্দ্র কপটতা সহ্য করতে পারেনি। তাই কুন্দের ক্ষতি করবার জন্য সে তৎপর হয়েছিল। দেবেন্দ্রর নিকট প্রত্যাখ্যাত ও পরিত্যক্ত হয়েই সে কুন্দের অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হলো। হীরার এরূপ পরিণতি একেবারেই সুখকর নয়। যদিও দেবেন্দ্রকে সে যথার্থই ভালবেসেছিল। তাই যার জন্য সে পরিত্যক্ত হয়েছিল সেই কুন্দকেই বিষপানের প্রতি প্রলুব্ধ হওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল। পরে কুন্দের মৃত্যুর পর হীরা উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়। এই মর্মান্তিক পরিণতি শিল্প-সৃষ্টির বিচারে কতটা যুক্তিযুক্ত তা তর্কের বিষয়। হীরার মত এই মর্মন্তুদ পরিণতিকে বঙ্কিমচন্দ্র এক সামাজিক ও পারিবারিক নীতিবোধের পরাকাষ্ঠা করেছেন। হীরা চরিত্রের উপর এই অবিচার সহজে ভুলবার নয়। এ কথা অস্বীকার করা যায় না নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর মধুর দাম্পত্য জীবনে কুন্দনন্দিনী ও হীরার বিয়োগান্তক পরিণতি অনিবার্য ছিল

কিনা তা ঔপন্যাসিক স্পষ্ট করেননি, কিন্তু বিনা দোষে, ঘটনার পরম্পরায় ও অভিঘাতে এই দুজনের জীবন মর্মান্তিক পরিণতির দিকে ধাবিত হয়েছিল- যার জন্য কেউই দায়ী ছিল না!

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসটি ১৮৭৮ সালে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পরে আরও তিনটি সংস্করণ হয়। নতুন সংস্করণের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের মধ্যেও প্রভূত পরিবর্তন ও সংযোজন ঘটে। ১৮৯২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালেই চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় -এটিই বর্তমানে সাধারণগ্রাহ্য উপন্যাস। এই উপন্যাসের নাম, লেখার সময় সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়, উপন্যাসের নামটিও নিরর্থক নয়, তবে তার উপলক্ষ্য বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারার জন্য একটি উইল তৈরি করেন। জানা যায়, যাদবচন্দ্র উইলে বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্পত্তির অংশ কিছুটা কম বন্টন করেন, অন্য ভ্রাতাদের অধিক পরিমাণে সম্পত্তির অংশ দান করেন। এই উইল নিয়ে অন্য ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটে। অবস্থা এতটাই চরম পর্যায়ে উপনীত হয় যে অভিমানী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পৈতৃক বাসস্থান কাঁঠালপাড়ার গৃহ ত্যাগ করে চুঁচুড়ায় বসবাস করতে থাকেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেখানে সাক্ষাৎ করতে যান ও বঙ্কিমচন্দ্রের চুঁচুড়া বাসের কারণ সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে পারিবারিক বিরোধ ও পিতার উইলের পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে অবহিত করেন। বিরোধ এতটাই তীব্র ছিল যে 'বঙ্গদর্শনে' কৃষ্ণকান্তের উইল ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়া বন্ধ হয়ে (প্রায় দু'বছর) যায়। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত। পরে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। চতুর্থ সংস্করণ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে। প্রথম সংস্করণ থেকে চতুর্থ সংস্করণ পর্যন্ত এই উপন্যাসে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষ করে রোহিণী ও গোবিন্দলাল চরিত্রে।

যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উইল ও উইলের কারণে পারিবারিক বিরোধ ও অভিমানী বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যত্র বসবাস এইটুকু মাত্র তথ্য ও সত্য, কৃষ্ণকান্তের উইলের অন্য সবই লেখকের কল্পনাসৃষ্ট। এই উপন্যাসটি বহু আলোচিত। শুধু চরিত্র-বিশ্লেষণই নয়, উপন্যাসের আঙ্গিক, ধারাবাহিকতা, ঘটনা পরম্পরা, আত্মবিশ্লেষণ ও জটিল মনস্তত্ত্ব অনুধাবন-বহু দিক থেকেই এটিকে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস বলা যায়। এই গুণগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিমিতিবোধ। ঘটনা বিন্যাস ও সুষ্ঠু সামঞ্জস্যবোধ এবং লিপিচাতুর্যে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস

হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এই উপন্যাসের আরেকটি গুণ হলো বাংলার পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের জীবনধারার সঙ্গে হার্দিক পরিচয়। শুধু জমিদারের সেরেস্তা নয়, গ্রামের পোস্ট অফিস, সেখানকার বকশিস-লোলুপ পোস্টমাস্টার, কর্মচারী, মহিলামহলের কথোপকথন, সরস আলোচনা এমনকি কৃষক ও ভৃত্যদের পারস্পরিক কথোপকথনের এমন সজীব ও নিখুঁত ছবি বর্ণনা করেছেন। আদালত ও সাক্ষীদের জবানবন্দীর চিত্ররূপে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে অঙ্কিত করেছেন। বলতে গেলে উপন্যাসের স্বল্প পরিসরের মধ্যেও এই বাস্তব জীবনের অভিব্যক্তি প্রশংসনীয়।

এবার এই উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করা যাক। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত চরিত্র রোহিণী। শরৎচন্দ্রের মতো কথাসাহিত্যিকও মনে করেন যে রোহিণীর চরিত্রাঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রূঢ় সামাজিক সংস্কারের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সর্বদাই সামাজিক ও দাম্পত্য প্রেমে বিশ্বাসী ছিলেন। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধেও তাঁর বিরুদ্ধতা অসত্য নয়। তাই স্বামীহারা কুন্দনন্দিনী ও রোহিণীর পুণর্বিবাহ তিনি অনুমোদন করেননি। 'বিষবৃক্ষে' কুন্দনন্দিনীর অন্তিম পরিণামই তার সাক্ষ্য। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ রোহিণীরও বিয়োগান্তক পরিণতিই ব্যক্ত করেছেন। প্রথম সংস্করণে রোহিণী লোভী ও প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী ছিল। তীব্র প্রণয়-আকাঙ্ক্ষায় সে হরলালের মতো শঠ, প্রবঞ্চক চরিত্রকে গ্রহণ করবার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতও ছিল। কিন্তু হরলালের বিশ্বাসঘাতকতায় রোহিণী নিজের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়েছিল। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে লেখক তাকে সেই সকল দোষ থেকে মুক্ত করে নতুনভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তবুও তার ভাগ্যতাড়িত জীবনের সঙ্গে তার চঞ্চল, দুঃসাহসিক পদক্ষেপ ও ভোগবাসনায় যে জীবনপিপাসার চিহ্ন রেখেছেন তা লক্ষ্য না করে পারা যায় না। বাংলা উপন্যাসের প্রথম বিদ্রোহিণী নারী রোহিণী। রূপে, গুণে, জীবন পিপাসায় তার তূল্য রমণী জগতে দুর্লভ। "রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল--শরতের চন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ,সে কালা পেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পড়িত, পানও বুকি খাইত। এদিকে রন্ধনে সে দ্রৌপদী বিশেষ বলিলে হয়, ঝোল, অম্ল, চড়চড়ি, সড়সড়ি, ঘন্ট, দালনা ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত, আবার আলপনা, খয়েরের

গহনা, ফুলের খেলনা, সূচের কাজে তুলনারহিত। চুল বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে পাড়ার একমাত্র অবলম্বন। তাহার কেহ সহায় ছিল না বলিয়া সে ব্রহ্মানন্দের বাটিতে থাকিত"।[১২] এমন গুণবতী রোহিণী গোবিন্দলাল বা হরলাল যেকোন পুরুষেরই আকর্ষক হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। হরলালও তার অসহায়তার সুযোগ নিয়েছিল। পরে রোহিণী পরিবর্তিত উইল যথাস্থানে রাখার বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়ায় রোহিণীকে বিবাহ করতে অস্বীকার করে। অপমানিতা রোহিণীও রায়বংশের অনিষ্ট সাধনের প্রক্রিয়া শুরু করে। হরলালের ভ্রাতস্পুত্র গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের গাঢ় প্রণয় রোহিণীর অগোচরে ছিলনা। ভাগ্যবিড়ম্বিতা রোহিণী গোবিন্দ লালের প্রতিই আকৃষ্ট হলো, অচিরেই তার রূপ গুণের মায়াজালে গোবিন্দলালকে যূপবদ্ধ প্রাণীর মতো করায়ত্ত করে ফেলল। গোবিন্দলালের ধর্মপত্নী ভ্রমর রূপে-গুণে রোহিনীর সমকক্ষ ছিলনা সত্যি, কিন্তু গোবিন্দলাল ও তার দাম্পত্যপ্রণয়ে কোনরূপ পার্থক্য ছিল না। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পরিবর্তনের পর রোহিণী জাল উইল কৃষ্ণকান্তের সিন্দুকে রাখবার সময় সজাগ কৃষ্ণকান্তের হাতে ধরা পড়ে, ফলস্বরূপ ভ্রমরের নিকটে যাবার সুযোগ পায়। গোবিন্দলাল তাকে ভুল সংশোধনের সুযোগ দিলেও চতুরা রোহিণী মনে মনে গোবিন্দলালকে করায়ত্ত করবার সুযোগ সন্ধান করে। বারুণী ঘাটে জল আনবার ছলে পুষ্পবীথিকায় তাদের সাক্ষাৎ ঘটে, তৎপরে রোহিণীর পুষ্করিণীতে আত্মহত্যার চেষ্টা, গোবিন্দলাল কর্তৃক তাকে উদ্ধার ও তৎপরবর্তী ঘটনা উভয়কেই হৃদয়ঘটিত বিষয়ে নিকটে আসার সুযোগ করে দেয়। ভ্রমরের ওপর রোহিণীর ঈর্ষাও এই ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে গোবিন্দলালের সঙ্গে হরিদ্রাগ্রাম ত্যাগ করে প্রসাদপুরে বসবাস তার চতুরতার পরিচয় দেয়। গোবিন্দলাল তার রূপবহ্নিতে আত্মহুতি দিয়েছিল ও ভ্রমরের অজ্ঞাতে গৃহত্যাগ করেছিল। রোহিণী জানত সে কখনোই সামাজিক মর্যাদা পাবেনা তথাপি নিজের জীবনতৃষ্ণা নিবারণ ও প্রকারান্তরে ভ্রমরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই সে গোবিন্দলালের সঙ্গে বসবাস করেছিল। হিন্দুদের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে বিধবা রমণীর কোনরূপ সাধ-আকাঙ্ক্ষা যে পরিপূর্ণ হবার নয়, তথাপিও সে সাধ বা কামনা কখনোই আচ্ছাদিত করে রাখাও যায় না, রোহিণী জীবন দিয়ে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে গেল।[১৩] এই সত্যের তীব্র আকর্ষণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে অবশেষে প্রণয়ীর পিস্তলের গুলিতেই মৃত্যুবরণ করল। রোহিণীর সেই জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা "রাত্রিদিন দারুণতৃষ্ণা, হৃদয় পুড়িতেছে, সম্মুখেই শীতল জল কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই"। বস্তুতঃ গোবিন্দলালের সংস্পর্শে রোহিণীর জীবনতৃষ্ণা দূরীভূত

হয়নি, কারণ সে চেয়েছিল সংসারের স্বাভাবিক চাওয়া-পাওয়া, স্বামী, পুত্র, সংসার, তার পরিবর্তে পেয়েছিল রক্ষিতার বিকৃত জীবন। তথাপি সে বিদ্রোহ করেছিল।তাই সোনা-রূপা-রাসবিহারীর ছলনায় সে ভুলপথে পদক্ষেপ করবে ভেবেছিল। পলায়নী জীবন থেকে মুক্তি চেয়েছিল। পরিণামে তার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছিল। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র রোহিণীর এই পরিণামে দুঃখিত হয়েছেন। সে পরিণাম নীতিনির্দেশক বঙ্কিমচন্দ্রই ব্যক্ত করেছেন। গোবিন্দলালের সংযমহীন বাসনার যূপকাষ্ঠে রোহিণীর আত্মবলিদান ছিল। রোহিণীর এই শোচনীয় মৃত্যু কয়েকটি প্রশ্নের জন্ম দেয়। গোবিন্দলাল কি রোহিণীকে সত্যিই ভালবেসেছিল? নাকি সে ভ্রমরের বিকল্প ছিল? শ্যামবর্ণা ভ্রমরের সঙ্গে দীর্ঘদিন সংসার করার ফলে একপ্রকার উদাসীনতা কি স্ত্রী প্রতি অনাগ্রহ বা অনীহার কারন ছিল? রোহিণীর রূপ-গুণ-বুদ্ধিমত্তার তদুপরি কিঞ্চিত নির্ধন পরিস্থিতিতে কাকা ব্রহ্মানন্দের কুটীরে গৃহকার্যে রতা রোহিনীর অসহায়তা কি গোবিন্দলালের এই পদস্খলনের কারণ? গোবিন্দলালের এই রূপতৃষ্ণা বা রোহিণীকে নিয়ে অজ্ঞাতবাসের পূর্বে তার দ্বিধা- দ্বন্দ্ব এই প্রশ্নের জন্ম দেয়। গোবিন্দলাল ইচ্ছে করলেই রোহিণীকে বিবাহ করতে পারত, কেননা বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মানবিকতার জন্যই বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তিত হয়। কিন্তু গোবিন্দলাল তা গ্রহণ করেনি। অত্যন্ত চতুরতাসহ ভ্রমরের সঙ্গে ছলনা করে রোহিণীকে নিয়ে হরিদ্রাগ্রাম ত্যাগ করেও সে রোহিণীকে একজন রক্ষিতার মতোই ব্যবহার করে। সে রোহিণীকেও বিশ্বাস করতো না তাই পরিচারকদের কথামতো রোহিণীকে অনুসরণ করে, রোহিণীর বিশ্বাসঘাতকতায় সে বিস্মিত হয় এবং বন্দুকের গুলিতে রোহিণীকে হত্যা করে।ভাগ্যবিড়ম্বিতা রোহিণী পরকীয়া প্রেমে প্রলুব্ধ হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলো। গোবিন্দলাল পরনারী আসক্ত হয়েও সামাজিকভাবে নিষ্কৃতি পেল। অথচ রোহিণীর ক্ষেত্রে এই বিচার অন্যরকম হলো। রোহিণীর মৃত্যুর পর ফেরার গোবিন্দলালের আইনি বিচার হয় এটা সত্য, তার শশুর মশাই মাধবীনাথের চাতুর্যে বিচারসভার সাক্ষীরা অনেক অসংগত ও বিলাপময় জবানবন্দী দেওয়ায় বিচারে গোবিন্দলাল মুক্তি পেল। তবে হরিদ্রাগ্রামে ফিরলনা। প্রসাদপুর, কলকাতা সকলস্থানে বসবাস করে ভ্রমরকে চিঠি লিখল যে সে অত্যন্ত আর্থিক দুরবস্থায় দিনযাপন করছে। ভ্রমর তাকে গ্রামে ফিরবার জন্য পত্র দিলেও আত্মাভিমানী গোবিন্দলাল গ্রামে ফিরতে অস্বীকার করল। পরিশেষে ভ্রমরের মৃত্যুসময়ে উপস্থিত হলো। ভ্রমরের মৃত্যুর পর সে নিরুদ্দেশ হয়। ১২ বছর পরে এক সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে হরিদ্রাগ্রামে উপস্থিত হয়। ভ্রমরের একটি সুবর্ণ মূর্তি মন্দিরে স্থাপণ

করা হয়েছিল। ভাগিনেয় শচীকান্ত গোবিন্দলালের সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। সেইই এই মূর্তি স্থাপিত করেছিল। গোবিন্দলালের এই মূর্তি দেখবার পর শচীকান্তকে আশীর্বাদ করে চলে গেল। বিষয় সম্পত্তিতে তার কোন মোহ নেই। অজ্ঞাতবাসের জন্যই সে সন্ন্যাসজীবন ধারণ করেছিল। এই সন্ন্যাসী বেশ ধারণ কি ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ, না স্বকৃত অপরাধের জন্য আত্মজিজ্ঞাসা বা আত্মদহন এই প্রশ্নটি মনে জাগরূক হয়। দুটি প্রাপ্তবয়স্ক ও সংসারী ও বিবাহিত নারীপুরুষ যখন এক অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়, তখন তাদের মধ্যে জুগুপ্সা ও অপরাধবোধের উন্মেষ হয়। গোবিন্দলাল ও রোহিণী এই দুজনই একই অপরাধে অপরাধী, একজন পতিব্রতা স্ত্রীকে অস্বীকার ও ত্যাগ করে পরনারীতে আসক্ত হয়, সেখানে সামাজিকতা বা পারিবারিক বন্ধন ছিল না, অন্যজন অর্থাৎ রোহিণী সামাজিক স্বীকৃতি পাবে না জেনেও কেবল মোহগ্রস্ত হয়ে ভ্রমরের সংসার ভেঙ্গে দিয়ে আত্মতৃপ্তি চরিতার্থ করতে উদ্যত হয়েছিল। আইনের বিচারে দুজনেই সমান অপরাধী কিন্তু এই অপরাধের শাস্তি পেতে হলো কেবল রোহিণীকে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই একদেশদর্শিতার দোষে দুষ্ট হয়েছেন। তিনি আইনজ্ঞ ও বিচারক ছিলেন, তিনি জানতেন যে হত্যা করা অপরাধ। হত্যাকারী নারী বা পুরুষ যেই হোক না কেন আইনের চোখে সমান অপরাধী। অথচ সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতীক জমিদার গোবিন্দলাল কেবল টাকার জোরে ও শ্বশুরের বুদ্ধিচাতুর্যে অপরাধী হয়েও আইনের বিচারে জেলমুক্ত হলো। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীকেই তার পদস্খলনের জন্য দায়ী করা হয়। যদিও আধুনিক সমাজব্যবস্থা ও আইনের বিচারে নারী পুরুষের সমান অধিকার কিন্তু আজও পারিবারিক বা সামাজিক বিপর্যয়ে নারী-শিশু অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন নারী বলাৎকারের শিকার হলে পরিবার ও সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়, এমনকি কোন কোন সময় সেই নারী আত্মহনন বা হত্যার শিকারও হয়ে থাকে। এই একবিংশ শতাব্দীতেও দেশে-বিদেশে প্রায় প্রত্যেকদিন এই ঘটনাগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। অথচ অপরাধী পুরুষরা স্বগর্বে সমাজে বিচরণ করে। আইনের কড়া অনুশাসনে তাদের কতটা শাস্তি বিধান করা যায় তা বিতর্কের বিষয়। ক্ষতিগ্রস্ত নারীর মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের কেউ পর্যাপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করে না। রোহিনীর মৃত্যুর পর তার কাকা ব্রহ্মানন্দের সংবাদ কেউ রাখেনি, রোহিনীকেই সবাই দোষী সাব্যস্ত করেছে। গোবিন্দলাল অপরাধী হয়েও সমাজে ফিরে আসে, ভ্রমরকে মৃত্যুসময়ে শুশ্রূষা করে। তার সন্ন্যাসী-বেশ বা "ভগবত পাদপদ্মে মনস্থাপন" নিছক পলায়নী মনোবৃত্তি ব্যতীত কিছুই নয়। ভাগিনেয় শচীকান্ত তাকে জিজ্ঞাসা করলে

সে বলে "কেবল অজ্ঞাতবাসের জন্য আমার এ সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ, সন্ন্যাসে কদাপী শান্তি পাওয়া যায় না।"[১৪]

গোবিন্দলালের চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা তার রূপতৃষ্ণা। এই রূপতৃষ্ণাই তার পদস্খলনের প্রধান কারণ। ভ্রমরের সঙ্গে দীর্ঘ দাম্পত্যজীবন কাটিয়েও সে রোহিনীর সঙ্গে পলায়ন করলো এবং তাও এক অভিনব উপায়ে। ভ্রমরের কাছ থেকে তার তীব্র রূপতৃষ্ণার মোহ নির্বাপিত হয়নি। রোহিনীর রূপ তার মনে চাতকের ন্যায় তৃষ্ণা জাগিয়ে তুলেছিল। অথচ ভ্রমরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতেও সে দ্বিধাগ্রস্থ ছিল। মানুষ যখন বিপথগামী হয় তখনও তার মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জেগে ওঠে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা যখন তীব্র তখন সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে বন্যার জলের মতো কামনা-বাসনা তীব্রতর হয়। গোবিন্দলালের ক্ষেত্রেও তাই-ই ঘটেছিল। ভ্রমরের পিত্রালয় যাত্রাও এই আগুনে ঘৃতাহুতি দিল। উভয়ের মধ্যে অদর্শনে প্রেমবন্ধনও শিথিল হল। গোবিন্দলালের মনে প্রাণে রোহিণীর প্রতি গাঢ় অনুরাগ ভ্রমরের প্রতি বিতৃষ্ণাকে আরও দৃঢ় করে তুললো। শেষ পর্যন্ত গোবিন্দলাল ভ্রমরকে পরিত্যাগ করবার কথা প্রকাশ করল— " এ কালো, রোহিনী কত সুন্দরী, এর গুণ আছে, তার রূপ আছে, এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি ,এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব— আমার এ অসার, এ আশাশূন্য, প্রয়োজনশূন্য জীবন ইচ্ছামত কাটাইবো। মাটির ভান্ড যেদিন ইচ্ছা সেদিন ভাঙ্গিয়া ফেলিবো"।[১৫] প্রথমাবধি গোবিন্দলালের রোহিণীকে শুধু ব্যবহার করার ইচ্ছে ছিল। ভ্রমরের অবিশ্বাস বা বালিকাসুলভ আচরণ এর জন্য কোনভাবেই দায়ী নয়। এমনকি রোহিণীর সঙ্গে প্রসাদপুরে অবস্থানকালেও সে ভ্রমরের কথা চিন্তা করছিল। প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল যখন রোহিনীর সঙ্গীতচর্চায় মুগ্ধ তখনও তার মনে ভ্রমরের চিন্তা। "ভ্রমর অন্তরে, রোহিনী বাইরে"। রোহিণীকে গ্রহণ করেই গোবিন্দলাল বুঝেছিল যে "রোহিনী খাঁচার পাখি নয় ,রোহিনী ভ্রমর নয়"। তার এই অনুরাগ কেবল রূপতৃষ্ণা, স্নেহ নয়, এ ভোগ, সুখ নয়। নীলকণ্ঠের বিষের মতো যে বিষ তিনি পান করেছেন তা জীর্ণ হওয়ার নয়, যৌবনের অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা শান্ত হয়নি। তাই রোহিনীকে সে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি। এমনকি যে রোহিনীর জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন সেই রোহিণীকে বললেন "তুমি আমার কে?"[১৬] রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য, অকলঙ্ক চরিত্র, ভ্রমরের মতো স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে যে রোহিণীকে গ্রহণ করেছিল, তাকে হত্যা করতে কিছু মাত্র দ্বিধা ছিল না-কারণ রোহিনী তার

কাছে তার অতৃপ্ত কামনার ভোগ্য সামগ্রী মাত্র। গোবিন্দলাল দুজন নারীকে ভালোবেসেছিল। দুজনের অন্তিম দশা মৃত্যুতে শেষ হলো।

উপন্যাসের পরিশিষ্ট অংশটি নীতিবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গোবিন্দলাল ও নগেন্দ্রনাথ উভয়েই নিঃসন্তান ছিলেন। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনযাপন করার পর সন্তানের আগমন দম্পতির মধ্যে মানসিক বন্ধন তৈরি করে। গোবিন্দলাল- ভ্রমর এবং নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখী এই দম্পতি যুগল নিঃসন্তান থাকায় জীবনের প্রতি কিঞ্চিত আশাহত হয়েছিলেন। সুখী দাম্পত্যজীবনের একটি অচ্ছেদ্য বন্ধন সন্তান-যা থেকে এরা বঞ্চিত ছিলেন। এটি পদস্খলনের কোন কারণ কিনা জানা যায়নি! তবে গোবিন্দলাল ও নগেন্দ্রনাথ এর কন্ঠে সন্তানহীনতার আক্ষেপ শোনা গেছে। নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল রোহিণীকে তার পরকীয়া প্রেমের সঙ্গিনী করে রেখেছিলেন। পুষ্পমন্ডপে গোবিন্দলাল ও রোহিনী কি পরামর্শ করেছিল, তাদের ভবিষ্যত পন্থা কি ছিল-সে সম্বন্ধে কিছুই লেখক জানাননি। তবে ব্যবস্থা যে উত্তম হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই!

অবশ্য উপলব্ধির আর একটু বিষয় আছে। গোবিন্দলাল মাকে কাশী বাসের জন্য পাঠিয়েছিল। সেখান থেকেই পলায়নের পরিকল্পনা করে। সে কি অর্থকড়ির সঙ্গে পিস্তলও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, নাকি তৎকালীন জমিদাররা আত্মরক্ষার্থে ব্রিটিশ শাসকের বদান্যতায় পিস্তলও লাভ করতেন? রোহিণী জীবনের কোন্ সত্যের ইঙ্গিত দিয়ে গেল? ভ্রমর মৃত্যু কামনা করেছিল, কারণ সে জীবনে যা পেয়েছিল তা হারানোর পরে জীবন তার পক্ষে অসহ্য হয়ে গিয়েছিল আর রোহিনী পিস্তলের গুলিতে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বাঁচতে চেয়েছিল। সে গোবিন্দলালের রক্ষিতা মাত্র, তা সে জানত। জীবন তার আশা পূরণ করেনি, তার জীবনতৃষ্ণাও অতৃপ্ত। এই জীবনকে সে হারাতে চায়নি। বিধবা রমণীর জীবন-তৃষ্ণা তীব্র আর্তনাদে পরিণত হয়ে মর্মান্তিক পরিণতি লাভ করলো। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র মনুষ্যত্বের আবেগ ও কামনা-বাসনাকে নীতিবোধের আদর্শে বিসর্জন দিলেন!

<u>গ্রন্থসূত্র-</u>

১) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, পৃষ্ঠা ৪৫-৪৮

২) বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, পৃষ্ঠা ৬-২০

৩) চট্টোপাধ্যায় ,বঙ্কিমচন্দ্র ,পৃ.২২

৪) তদেব,পৃষ্ঠা ২১২-২১৩

৫) বসু, সোমেন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ১২০

৬) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, পৃষ্ঠা ২১২

৭) চট্টোপাধ্যায় ,বঙ্কিমচন্দ্র, পৃষ্ঠা ১২৫

৮) শ, রামেশ্বর, পৃষ্ঠা ২১

৯) চট্টোপাধ্যায় ,বঙ্কিমচন্দ্র, পৃষ্ঠা ৪৭-৪৮

১০) তদেব, পৃ. ৫৬

১১) চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, পৃষ্ঠা ২৩

১২) তদেব, পৃষ্ঠা ৪৯১

১৩) চক্রবর্তী ,সুমিতা, পৃষ্ঠা ১১৬

১৪) চট্টোপাধ্যায় ,বঙ্কিমচন্দ্র, পৃষ্ঠা ১৫৩

১৫) তদেব, পৃষ্ঠা ৫২৬

১৬) তদেব, পৃষ্ঠা ৪৮৩

<u>গ্রন্থপঞ্জী-</u>

১) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা।* কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক, ১৯৬৫।

২) বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।* কলকাতা, পুস্তক বিপণী, ১৯৮১।

৩) চট্টোপাধ্যায় ,বঙ্কিমচন্দ্র। *ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত।* সাহিত্য সাধক চরিতমালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৬১।

৪) চট্টোপাধ্যায় ,বঙ্কিমচন্দ্র। *গোপাল হালদার সম্পাদিত বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ।* কলকাতা, সাক্ষরতা প্রকাশন, প্রণব ঘোষ, ১৯৭৪।

৫) বসু, সোমেন্দ্রনাথ। *সম্পাদিত ও সংকলিত, কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র।* বুকল্যান্ড প্রা. লি.,কলকাতা, ১৯৬০।

৬) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।* ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৭৪।

৭) চট্টোপাধ্যায় ,বঙ্কিমচন্দ্র। *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত বঙ্কিম রচনাবলী।* কলকাতা , ১৯৬৪।

৮) শ রামেশ্বর। *আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রবন্ধ।* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৪২৯।

৯) চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। *বঙ্কিম রচনাবলী।* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭৩।

১০) চট্টোপাধ্যায় ,বঙ্কিমচন্দ্র। *কৃষ্ণকান্তের উইল।* বঙ্গদর্শন ১২৮৪, কলকাতা, ১৮৭৮।

১১) চক্রবর্তী ,সুমিতা। *উপন্যাসের বর্ণমালা।* পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ২০২২।